ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1574-1580
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.378

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙলার ডাকাত': অন্তরঙ্গ অবলোকন

শাশ্বতী সেনগুপ্ত, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The evolution of Bengali children's literature reached its peak in the 20th century, with historian Yogendranath Gupta playing a pivotal role. His most celebrated work, 'Banglar Dakat' stands as a unique masterpiece that blends historical research with gripping storytelling. Rather than relying on pure fantasy, Yogendranath drew from his background as a historian to investigate the real-life accounts of notorious bandits across rural Bengal, particularly during the early years of British rule when the Nawabs held only nominal power. The book vividly portrays a period of extreme lawlessness where the lives of ordinary people were made miserable by constant exploitation and violence. Yogendranath categorizes these bandits into two distinct groups- the cruel oppressors and the humanitarian outlaws. The former often included wealthy landlords who led double lives, acting as pillars of society by day and committing brutal robberies by night. In sharp contrast, the latter group functioned much like the Western 'Robin Hood' or Bankim Chandra's 'Bhabani Pathak'. These bandits targeted oppressive zamindars and redistributed stolen wealth among the impoverished, acting as protectors of the needy during times of crisis.

Beyond the historical data, the literary brilliance of the work lies in Yogendranath's ability to create a suspenseful and atmospheric narrative. By employing short, simple sentences and dramatic dialogues, he transformed historical and geographical facts into an engaging experience for the reader. Ultimately, 'Banglar Dakat' is not merely a collection of adventure stories; it is a profound socio-political reflection of Bengal's past that satisfies the reader's curiosity with reliable information rather than mere exaggeration.

Keywords: Children's literature, Bandits, Miserable, Robberies, Adventure

স্রষ্টা তাঁর আপন লীলায় যে জগতের সৃজন করেন তাকে সাহিত্য-শিল্প-ভাস্কর্যে তাঁরই সৃষ্ট মনুষ্য করে তোলে অনন্য। স্থূল প্রয়োজনীয়তায় পড়ে মনোধর্মের প্রলেপ। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার বহুবিধ শাখায় আমরা সেই সব নিদর্শন পাই। সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত রূপকথা-উপকথার গল্প সময়ের প্রবহমানতার সাথে সাথে শিশু-কিশোর সাহিত্যে পর্যবসিত হয়। রহস্য, রোমাঞ্চ ও ভূতের গল্পের পাশাপাশি চোর, ডাকাত এবং ঠ্যাঙাড়েদের কাহিনিও অচিরেই কিশোর-কিশোরীদের মনের মণিকোঠায় স্থান দখল করে নেয়। মূলত ঊনবিংশ শতকে শিশু-কিশোরদের উপযোগী বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করলেও বিশ

শতকে তা পত্রে-পুষ্পে-পল্লবে বিকশিত হয়। আর এক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অবদান যে অনস্বীকার্য সেকথা বলাই বাহুল্য।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অভূতপূর্ব তথা বিপুল সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে কণ্ঠহারে রত্নতুল্য একটি পরম আস্বাদনীয় গ্রন্থ হল 'বাঙলার ডাকাত'। এই নামে বাংলা সাহিত্যে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে খগেন্দ্রনাথ মিত্র,ধীরেন্দ্রনাথ ধর এবং পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখের রচনা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই একই শিরোনামে 'মহালয়া' উপলক্ষে দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা কর্তৃক সম্প্রচারিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় ভাষ্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত দু:স্প্রাপ্য একটি গল্পেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তবে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা 'বাঙলার ডাকাত' সর্বাধিক জনপ্রিয় ও পঠিত গ্রন্থ বিশেষ। যদিও এই ধরনের গল্পগ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা লেখকের ছিল না বলেই জানা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি উৎসর্গপত্রে লেখেন-

> "কল্যানীয়া শ্রীমতী সুনন্দা দাশগুপ্তা, এম.এ. চিরায়ুষ্মতীষু,
> তুই যখনরে ছোট ছিলি নিতি সাঁজের বেলা,
> আমার একটি কাজ ছিল মা, তোরে গল্প বলা।
> .....
> ডাকাতদের গল্প বলো যাদের হাতে হাতিয়ার,
> হা-রে-রে-রে করে ছোটে কত বন নদীর পার।
> তে-মহলা বাড়ী লোটে, নাইকো তাদের ডর,
> কালিমাখা ঝাঁকড়া চুলেতে দেখায় ভয়ংকর।
> তাই তো আজ এনেছি ধরি 'বাঙলার ডাকাতে'
> আশিসবাণী সাথে দিলাম তোরেই কোমল হাতে।
> -বাবা"[১]

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মূলত একজন ইতিহাসবিদ হওয়ায় তৎকালীন বাংলাদেশের অতীতের নানান তথ্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেসব দুর্ধর্ষ ডাকাতির কাহিনির খোঁজ পান তারই উপর ভিত্তি করে 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থটি রচনা করেন। তবে প্রথমে এই গল্পগুলি মাসিক 'শিশুসাথী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমান্বয়ে চারটি খন্ডে (প্রথম খন্ড-১৯৫৫ খ্রি:, দ্বিতীয় খন্ড-১৯৫৮ খ্রি:, তৃতীয় খন্ড-১৯৭৫ খ্রি: ও চতুর্থ খন্ড-১৯৭৮ খ্রি:) প্রকাশিত হয়। যা অখন্ড সংস্করণে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে। তখন নবাব ছিলেন নামেমাত্র শাসক। অর্থাৎ তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার চিত্র যে গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে একথা বলাই বাহুল্য। সেসময় শুধু বাংলা নয়, চরম অরাজকতা, শোষণ ও বিশৃঙ্খলায় দেশ ভরে যায়। খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি ও অন্যায়-অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি নরবলির মতো নৃশংস ঘটনাও প্রায়শই সংঘটিত হত, "নরবলি দিয়া মায়ের পূজা করা ডাকাতির প্রথা ছিল।"[২] লেখক এই বিশৃঙ্খল সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "দেশে শাসন নাই, কেহ কাহাকেও দেখে না- দস্যুদল নির্ভীক ভাবে ডাকাতি করে।"[৩] তবে ডাকাত দলে কোন জাতিভেদ ছিল না।

এইসময় ধনী তথা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের তুলনায় নিম্নবিত্ত তথা সাধারন মানুষেরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। একদিকে কোম্পানির অত্যাচার-অনাচার অন্যদিকে দুর্বৃত্ত তথা ডাকাতের ভয়ে তারা দিশেহারা

হয়ে পড়ে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করে অনেকেই একপ্রকার বাধ্য হয়ে দস্যুদলে যোগদান করে।

ডাকাতির মতো ঘটনা সেকালের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হওয়ায় অধিকাংশ মানুষই লাঠি, সড়কি ও বল্লম চালনায় পারদর্শী ছিল। আর এ ব্যাপারে নারীরাও যথেষ্ট দক্ষ ছিল। বিপদকালে পরিবার তথা প্রজাবর্গের রক্ষাকারিণী হয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে পাপ ও পাপীর বিনাশে তারা পিছপা হতেন না। 'বীরাঙ্গনা অন্নদা দেবী ও ডাকাত দল' গল্পে অন্নদার সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়,

> "অন্নদা দেবী তাহার কেশ এলাইয়া দিলেন- তাঁহার দীর্ঘ ও মেঘের মত কালো কেশ পিঠে এলাইয়া পড়িল। তিনি কপালে পরিলেন বড় করিয়া সিন্দুরের টিপ- সারামুখে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন কালি, কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত টানিয়া পরিলেন এবং খড়্গ হাতে লইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া কালীমূর্তির মত নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে- অনড় অটল। ... তাহারা দেখিল ভীমা ভয়ংকরী কালীমা দাঁড়াইয়া আছেন।"[৪]

তার এই অসম সাহসিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ১২৯৪ সনের এই ঘটনাটি তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 'ডাডুভাই, ডাডুভাই, টুমি ডাকাট', 'মহামায়া ঠাকুরণ ও চাঁদা ডাকাত', 'বীরাঙ্গনা দয়াময়ী', 'ব্রাহ্মণী ও ডাকাত দল', 'সাহসিকা বধূ', 'মেয়ের বুদ্ধি' প্রভৃতি গল্পে নারীর অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

যদিও ডাকাতদের সকলেই যে অত্যাচারী ছিল এ কথা সর্বৈব সত্য নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয়, 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থে লেখক যেসব ডাকাতের কথা বলেছেন তাদের কার্যকলাপ অনুযায়ী দুটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে আলোচনাকে অগ্রসর করা যেতে পারে। এর মধ্যে এক শ্রেণির ডাকাত ছিল 'তুলসি বনের বাঘ'। তারা কখনো সৎ, অতিথিবৎসল গৃহস্থ সেজে; কখনো আবার ভন্ড ধার্মিক বা সাধুবেশধারী সদাশয় ব্যক্তি সেজে ডাকাতি করত। এজন্য তারা পরোপকারীর মুখোশ পরে প্রথমে রাস্তা-ঘাটে বিপদগ্রস্ত মানুষদের নিজেদের ডেরায় আশ্রয় দিত এবং রাত্রি গভীর হলে স্বরূপে তথা সদলবলে যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করত। এজন্য তারা সাধারণ মানুষদের মারধোর থেকে শুরু করে হত্যা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তৎকালীন জমিদারদের অধিকাংশেরই পেশা ছিল দিনে নিজের জমিদারি পরিচালনা করা ও রাত্রিতে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া।

'এ কার আংটি বাবা' গল্পে উত্তরবঙ্গের কুলপি গ্রামের জমিদার রামজীবন সান্যাল ছিলেন এমনই এক কুখ্যাত ডাকাত। নিষ্ঠুর, লোভী রামজীবনের এই অসৎ কর্মের প্রতিবাদ করার সাহস পরিবার বা প্রজাবর্গের মধ্যে কারোরই ছিল না। তিনি দিনের বেলা জমিদারি আর রাতের বেলা ডাকাতি করতেন। এমনই এক নৈশ অভিযানে তিনি আপন জামাতা ক্ষিরোদকুমারের ডিঙা লুঠ করে তাকে হত্যা করে সোনার হার ও আংটি আত্মসাৎ করেন। পরদিন মধ্যাহ্নে কন্যাকে সেই আংটি উপহারস্বরূপ দিতে গেলে নির্মম সত্য উদঘাটিত হয়-

> "কন্যা আংটি দুইটি হাতে লইয়া চমকিয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাতর কণ্ঠে বলিল- এ কি! এ কি করেছো বাবা? দেখ একবার চেয়ে দেখ- এ কার আংটি বাবা? এ যে তোমার জামাই-এর আংটি।"[৫]

এই দুঃসংবাদে সারা বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায় এবং গল্পের শেষে রামজীবন উন্মাদ হয়ে যান।

'নদীর বুকে ডাকাতি' গল্পে এরকমই এক ভয়ঙ্কর ডাকাতির কথা জানা যায়। মহাজন জগদীশচন্দ্র দত্ত বরিশালের দক্ষিণের এক গঞ্জের বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নদীপথে ব্যবসার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চার-পাঁচটি

নৌকায় অতি সন্তর্পনে যাতায়াত করতেন। ফলে ডাকাতেরা কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। পরে নমঃশূদ্র দলের সর্দার কানাই ওরফে কিনু মন্ডল সঙ্গীদের নিয়ে দত্তবাবুর নৌকা লুঠ করার পরিকল্পনা করে। কুমড়ো ও হাঁড়ি বোঝাই করে বিক্রির ছলে তারা দত্তবাবুর নৌকার মাঝি মদনের সঙ্গে ভাব জমায় এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাকেও নিজেদের ষড়যন্ত্রে সামিল করে। এরপর অপরাহ্নকালে জগদীশবাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদন সন্ধ্যার মধ্যেই আড়তে পৌঁছানোর কথা বলে নৌকা খোলে। নৌকা মাঝনদীতে পৌঁছানো মাত্র কুমড়ো ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশধারী ডাকাতেরা দত্তবাবুর নৌকাকে ঘিরে ফেলে এবং ক্ষণিকের মধ্যে জগদীশবাবু সহ সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে নদীর জলে ফেলে দিয়ে টাকা-কড়ি সহ সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে নেয়। যে ডাকাতদের প্ররোচনায় মদন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে যাতে পরে তাদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে না পারে তাই ডাকাতেরা তাকেও হত্যা করে নৌকাটি জলে ডুবিয়ে দেয়।

'বৈশাখী ঝড়ের রাতে' গল্পে সেকালের দুর্ধর্ষ ডাকাত কলিমুদ্দি মিঞার কথা জানা যায়। প্রায় একশ বছর আগের ঘটে যাওয়া এক লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা আছে এই গল্পে। সেসময় বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একদিন চিকনিসার গ্রামের বাসিন্দা রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক তার কন্যা ও কন্যার এক বছরের শিশুসন্তান কে নিয়ে রামপালের পার্শ্ববর্তী একটি খাল দিয়ে নৌকায় করে গৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হলে নৌকা চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সঙ্গের টাকা- পয়সা, অলঙ্কারাদি নিয়ে রাজেন্দ্রবাবু মহাফাঁপরে পড়লেন,

> "এমন সময় সন্ধ্যার অল্প পরেই আরম্ভ হইল কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডব নৃত্য। মাঝি ভয় পাইল। ঝড়ে খালের বুকে ঢেউ উঠিয়াছে। নৌকা আছাড়ি- পাছাড়ি খাইতেছে। শুকুর মোল্লা 'আল্লা, জান-প্রাণ বাঁচাও', বলিয়া চিৎকার করিতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেয়েকে বলিলেন- মা, দাদুকে বুকে ধরে রাখ। যেন ঝড়- ঝাপটা ওর গায়ে না লাগে.... নারায়ন নারায়ণ! রক্ষা কর।"[৬]

উপায়ন্তর না দেখে তারা বাধ্য হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে শুরু করে। সেই সময় কলিমুদ্দি ঝড়-জল উপেক্ষা করে বাইরে গিয়ে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। তার স্ত্রী রহিমাবিবিও রাজেন্দ্রবাবুর কন্যা ও কন্যার শিশু সন্তানটিকে সস্নেহে ঘরের ভিতর নিয়ে যায় এবং শিশুটির জন্য জ্বাল দেওয়া গরম দুধের ব্যবস্থা করে তাকে ব্যাকুলভাবে আদর করতে থাকে। কিন্তু রাত্রি গভীর হলেই কলিমুদ্দির পরোপকারীর মুখোশ খুলে পড়ে,

> "ঐ ঘরের মধ্যে ডাকাত কলিমুদ্দি নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিল- সঙ্গে কি আছে সব বাইর কর বামুন! যদি না দেও তবে সকলকে কাইটা বিলের জলে ফালাইয়া দিমু! ...এ- অঞ্চলে কলিমুদ্দি ডাকাতের নাম কেনা জানে? সব দেও, নইলে এখনি নিমু গার্দানা।"[৭]

কিন্তু ইত্যবসরে রহিমাবিবি 'দৃপ্তা সিংহিনী'র মতো বঁটি- দা হাতে কলিমুদ্দি সহ ডাকাত দলকে নিরস্ত করে। রাজেন্দ্রবাবু, তার কন্যা ও কন্যার শিশু পুত্রটির প্রাণ রক্ষা হয় এবং তারা নিজ গন্তব্যে নিরাপদে পৌঁছায়।

এছাড়াও, রহিম, গঙ্গারাম ও নিতাই ডাকাতের চরিত্রে নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার যে চরম দৃষ্টান্ত পাই তাতে আজও আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই।

অন্যদিকে অপর এক শ্রেণির ডাকাতেরা ছিল মানবতার দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত। অরাজকতাময় ও তমসাদীর্ণ সেই সময়ে তারা ছিল আশার আলো স্বরূপ। তারা তখন গরিবের পরিত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়। ইতিহাস সাক্ষী সময়, সমাজ ও পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। সুকোমল প্রবৃত্তিগুলিকে করে বিনষ্ট। তবুও অন্তরের অন্ত:স্থলে বহমান সুগুপ্ত ফল্গুধারার মতো দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার রসে সিক্ত হৃদয়ের পরিচয় আমরা ডাকাতদের চরিত্রেও পাই। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির মতো

সমাজনিন্দিত ঘৃণ্যকর্মে তারা লিপ্ত হলেও শুধুই 'আখের গোছানো'-ই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। দেশভক্তি ও পরোপকারের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ বহু ডাকাতের সন্ধান দিয়েছেন লেখক এই গ্রন্থে। পাশ্চাত্যের 'রবিন হুড' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভবানী পাঠক'-এর মতোই তারা অত্যাচারী, ধনী, প্রজাপীড়ক জমিদারের ধন-সম্পদ লুঠ করে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে অকাতরে বিলি করেছে। দু:খে-কষ্টে তাদের পাশে থেকেছে।

এই গ্রন্থের 'ঠগীর হাতে প্রাণরক্ষা' গল্পে ডাকাতদের বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। কালী বাগ্দী আদতে একজন ডাকাত হলেও রানী সর্বমঙ্গলা দেবীর কাছে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর সাথে পুরীতীর্থে যাওয়ার ও তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার বিষয়ে সম্মতি জানায়। রাণীমাও তাদের পরিবারের জন্য এক মাসের উপযোগী টাকাকড়ির ব্যবস্থা করলে পরদিনই সকলে পুরীযাত্রা করে। কিন্তু রাত্রি গভীর হলে সুযোগ বুঝে ঠগীরা রাণী সর্বমঙ্গলার তাঁবুর উপর সহসা হামলা চালায়। তীর্থযাত্রীদের তীব্র আর্তনাদে কোলাহল শুরু হয়। কালী মুহূর্তের মধ্যে চার-পাঁচ জন ঠগীকে হত্যা করে এবং যে ঠগী সর্বমঙ্গলা দেবীর গলায় রুমালের ফাঁস লাগাতে গিয়েছিল তার পা-দুটি কেটে ফেলে। এভাবেই ডাকাতদলের তৎপরতায় সকলেই ঠগীর হাত থেকে রক্ষা পায়।

'বিশ্বনাথ ডাকাত' গল্পে আমরা এক মানবিক ডাকাতের সন্ধান পাই। প্রায় একশ বছর আগে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত রিষড়া গ্রামটি জনবিরল এবং ভয়ংকর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রামে বিশ্বনাথ ডোম নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত বাস করত। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের সবল এই ডাকাত লাঠি, তরোয়াল চালনায় এবং বর্ষা নিক্ষেপে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তার নামে সকলে সন্ত্রস্ত থাকত,

> "বিশ্বনাথের সুগম্ভীর কর্কশ কণ্ঠস্বর, মদ্যপানের জন্য জবাফুলের মত রক্তচক্ষু, হা-রে-রে-রে চিৎকার ও নিত্য নতুন উপদ্রবের জন্য তাহাকে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয় করিত।"[৮]

কিন্তু তা সত্ত্বেও তার একটা মহৎ গুণ ছিল,

> "সে দীন-দরিদ্রদের উপর কখনও কোন অত্যাচার- উৎপীড়ন করিত না, এজন্য দরিদ্রেরা তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। অনেক সময় দীন- দরিদ্রদের সে গোপনে সাহায্য করিত।"[৯]

একবার নবদ্বীপের কাছাকাছি একটি গ্রামে 'ওলাউঠা' বা 'কলেরা' রোগের প্রকোপ দেখা যায়। সেই গ্রামের এক বুড়ির একমাত্র নাতির ওলাউঠা হওয়ায় সেই বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। সেই সময় সে গ্রামেরই জমিদার বাড়িতে এক ডাক্তার পালকি করে রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারের পালকি দেখে বৃদ্ধা তার অসুস্থ নাতির প্রাণ রক্ষার আর্জি জানালে ডাক্তারবাবু তাকে টাকা ছাড়া পরিষেবা দিতে রাজি হয় না। এইসময় বিশ্বনাথ ডাকাত সেখানে উপস্থিত হয়ে নাতিদূর থেকে বৃদ্ধা ও ডাক্তারের কথোপকথন শুনে তার দলের লোকেদের ডাক্তারকে ধরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। বিশ্বনাথ, ডাক্তারকে বুড়ির নাতিকে ভালো করে দিলে পঞ্চাশ টাকা নগদ দেওয়ার কথা জানায়। কিন্তু একাজে রাজি না হলে তার গর্দান নেওয়ার কথাও জানায়। অবশেষে ডাক্তারের চেষ্টায় বৃদ্ধার নাতি সুস্থ হয়ে ওঠে। এমনকি বিশ্বনাথ সে গ্রামের ওলাউঠায় মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থাও করে। বৃদ্ধা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালে এবং তার ডাকাত পরিচয় জেনে ভীত হলে সে বলে, "কোন ভয় নেই মা, কখনও বিপদে পড়লে, মনে রাখিস্ তোর এই ডাকাত ছেলেকে।"[১০] তাই আদতে একজন ভয়ংকর ডাকাত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই তাকে ভালোবাসতো।

যোগেন্দ্রনাথের এরকমই আরেকটি বিখ্যাত ছোটগল্প হল 'মনোহর ডাকাত'। প্রায় দুশো বছর আগে মনোহর বাগ্দী ওরফে মনোহর ডাকাত নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত চন্দননগর, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ডাকাতি করে বেড়াত। একদিন গভীর রাতে বনপথে ডাকাতি করে ফেরার সময় মনোহর ডাকাত ও তার সঙ্গী-সাথীরা এক মৃতপ্রায় স্ত্রীলোক ও শিশুর নিথর দেহ খালের ধারে পড়ে থাকতে

দেখে। মনোহরের নির্দেশে ও ডাকাতদলের তৎপরতায় তাদের মনোহরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ডাকাতদের সেবাযত্নে শিশুটি কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচলেও স্ত্রীলোকটি মারা যায়। এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে শিশুটিকে সে নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বিধবা পিসিকে শিশুটির দায়িত্ব নিতে বললে উল্টে পিসি তাকে গলা টিপে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মনোহর বলে, "ডাকাত বটি কিন্তু এ হাতে কোনদিন মাইয়া মানুষ আর ছোট ছোট ছাইল্যা মাইয়া মারি নাই।"[১১] মনোহরের এই উক্তির মাধ্যমে তার চারিত্রিক গুণাবলী তথা সুকোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর মনোহর নিজেই সেই ছেলেটির দায়িত্ব নেয় ও তার নাম দেয় হারাধন। শেষাবধি সে ডাকাতি ছেড়ে কৃষিকাজে মন দেয় এবং হারাধনকে সুশিক্ষিত করার পাশাপাশি তার নিজের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। তাই মৃত্যুর আগে ডাকাতি করা ধন-সম্পদ হারাধনকে দিয়ে গরিব মানুষ ও গবাদি পশুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কয়েকটি পুকুর খননের নির্দেশ দেয়। কালের অমোঘ নিয়মে মনোহরের জীবন প্রদীপ নিভে গেলেও দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত 'মনোহরপুকুর রোড' আজও তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে।

গল্পের আবহ তৈরিতে পরিবেশ-পরিস্থিতি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে একথা বলাই বাহুল্য। গল্পগুলির রহস্য রসায়িত পরিবেশ সৃষ্টিতেও লেখক বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। সেই সঙ্গে চেনা পরিবেশকে বাস্তব ও তথ্যসমৃদ্ধ ঘটনাবলী সহযোগে লেখক আপন মুন্সিয়ানায় হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন। ফলে পাঠক সহজেই সেই পরিবেশে একাত্মবোধ করেন, রহস্যের শিহরণ হৃদয়ে চমক জাগায়,

> "বৈদ্যনাথের আড্ডার চারিদিকে ছিল গভীর জঙ্গল। সাপ-বাঘের ভয়। সেই জঙ্গলের পাশে ছিল একটি ছোট নদী। নাম খড়িয়া। খড়িয়ার পারে সেই ভীষণ অরন্যানীর বুকে ছিল এক মন্দির। মন্দিরে ছিল ভীমা মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি বিরাজমানা। ভগ্ন জীর্ণ মন্দির। গাছপালা লতায় এমন করিয়া চারিদিক বেড়ায়াছিল যে, মন্দিরের সংবাদ খুব অল্প লোকেই জানিত। ঐ অঞ্চলে দস্যুভয় ছিল অত্যন্ত প্রবল।"[১২]

ঠিক তেমনই 'গোবিন্দ হালদার ও হরিচরণ মাঝি' গল্পে দেখি,

> "রাত্রিকাল। অগ্রহায়ণ মাসের সাতাশে কি আঠাশে তারিখ। আসন্ন শীতের রাত্রি। নৌকা চলিয়াছে নদীর বুকে। তীরে তীরে ঘন অন্ধকার। আচ্ছন্ন আকাশ। নদীপারের পল্লীগুলি মসীমাখা। আকাশে তারা ফুটিয়াছে। নদীর জল ছলছল কলকল করিয়া ছুটিতেছে। নৌকার ভিতর দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া শীতের বাতাস ঢুকিতেছে।"[১৩]

আসলে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি ঐতিহাসিক হিসেবেও বহু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করতেন। তাই গল্পগুলি বাস্তবের পটভূমিতে স্বতঃস্ফূর্ত গতি লাভ করেছে। ডাকাতির মতো লোমহর্ষক সত্য ঘটনাগুলিও তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যরসে জারিত হয়ে পাঠকের কাছে পরম আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থের গল্পগুলির নির্মাণশৈলী বিষয়েও বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ছোট ছোট সহজ- সরল বাক্যের ব্যবহারে গল্পগুলি গতি লাভ করেছে। শুধুমাত্র ভাষার যথাযথ প্রয়োগে লেখক অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। এমনকি প্রকৃতি চিত্রণেও লেখকের দক্ষতা প্রশংসাতীত। দু-একটি কথায় চরিত্রাঙ্কন তথা ডাকাত ও নারীর চরিত্র চিত্রণেও লেখকের সংলাপ কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ভাষায় নাটকীয়তা সৃষ্টি এবং উপমা ও ব্যঞ্জনার ব্যবহারে বীভৎস রসের উৎসারে গল্পগুলি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থটিতে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির এক সামগ্রিক পরিকাঠামো পরিলক্ষিত হয়। লেখক কল্পনার পাখায় ভর করে গল্পগুলিকে

অতিরঞ্জিত করেননি। বরং নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা পাঠকের জ্ঞানপিপাসাকেও চরিতার্থ করেছেন। তাই দুর্ধর্ষ তথা নৃশংস ডাকাতের হৃদয়ের অতলে সুকোমল মানবিক গুণাবলীর সন্ধান পেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আসলে কিশোর-কিশোরীদের মনে ছোটবেলা থেকেই ডাকাতের প্রতি যে ভয় মিশ্রিত কৌতূহল দেখা যায় 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থে তার যথাযথ রূপায়ণ ঘটেছে বলা যায়। তাই গ্রন্থটি আজও আবালবৃদ্ধবনিতার দরবারে সমান জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। বাঙলার ডাকাত। শৈব্যা প্রকাশন, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. উৎসর্গ।
২. তদেব, পৃ. ৪৩।
৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
৪. তদেব, পৃ. ১৪।
৫. তদেব, পৃ. ১৪৯।
৬. তদেব, পৃ. ১৪১।
৭. তদেব, পৃ. ১৪২।
৮. তদেব, পৃ. ২৪।
৯. তদেব, পৃ. ২৪।
১০. তদেব, পৃ. ২৫।
১১. তদেব, পৃ. ৫৬।
১২. তদেব, পৃ. ১৫০।
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা,প্রথম মুদ্রণ ১৩৬৬
২. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শিশু- সাহিত্য (১৮১৮-১৯১৮)। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮
৩. বসু, বুদ্ধদেব। বাংলা শিশুসাহিত্য। সাহিত্যচর্চা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৯
৪. সেন, নবেন্দু। বাংলা শিশুসাহিত্য: তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ। পুঁথিপত্র, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০০
৫. গোস্বামী ভট্টাচার্য, মহুয়া। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন (১৯৫০-২০০০)। পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১১।